গণেশ পাইনের চিঠিতে মূর্ত ‘শিল্পচিন্তা’

শিল্পী হিসাবে পরিচিতি তাঁর ছিলই। কিন্তু লেখক হিসাবে এই প্রথম আত্মপ্রকাশ করলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ মণ্ডল।

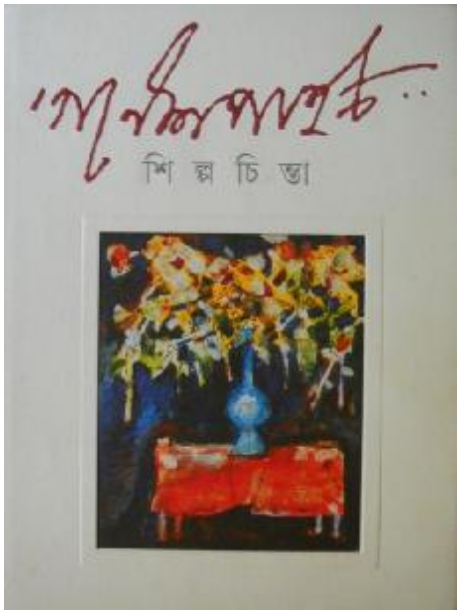

Diploma Certificate পুরস্কার পাওয়ার প্রমাণপত্র হাতে নিয়ে চাকুরি-চত্বরে ঘুরে ঘুরে ক্রমশ ক্লান্ত হয়েছি। জোটেনি কিছুই, অর্থকষ্টও পিছু ছাড়েনি

... ... অতঃপর কোমর বেঁধে ছবি আঁকার পালা শুরু হল। সারারাত ধরে পোস্টকার্ড মাপের কাগজে একের পর এক ছবি এঁকে গেছি শৈলী নির্বাচনের তাগিদে

... ... ছবি আশৈশবের ক্রীড়াক্ষেত্র ছিল। এখন সেই খেলাই সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছে যেন। আঁকছি। নষ্ট করছি। পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। আরো খেপে উঠছি। যা ধরা দিচ্ছে আমারই মনগড়া এক আলোকসামান্য চ্যুতি।

উপরিউক্ত কয়েকটি খণ্ডচিত্র থেকে অবশ্যই একজন মহান শিল্পীর সমগ্র জীবনব্যাপী ঘটে চলা আলো-ছায়ার পাঁচালি জেনে ফেলা সম্ভব নয়; তথাপি আমার মত একজন সাধারণ ছবি আঁকিয়ের কাছে এইরকম উক্তি জীবনকে অন্যভাবে ভাবানোর তাগিদ এনে দেয়।

১৯৭৫-এ সুদূর জার্মানি থেকে চিকিৎসাশাস্ত্র ও আপাদমস্তক বিজ্ঞান ভাবনায় বুঁদ একজন মানুষ ভারতীয় চিত্রশিল্পের আর একজন প্রাণপুরুষকে শুধুমাত্র ছবি ভালোবেসে একের পর এক চিঠি লিখে চলেছেন। কালক্রমে সেই পত্রালাপ সমসময়ের কলকাতা তথা বঙ্গের সামাজিক, রাজনৈতিক পরিসরে ঘটে চলা মেঘ-রোদ্দুরের প্রামাণ্য দলিল হয়ে উঠেছে। বইটি পড়তে পড়তে শিল্পী গণেশ পাইনের মানসলোকের যে বর্ণনা পাচ্ছি তার থেকে প্রতি রাত্রে এক একটি দিগন্ত খুলে যাচ্ছে চোখের সামনে। কৌতুকের ছলে দুই বন্ধুর কথোপকথনে তৎকালীন ভারতবর্ষের শিল্পীকূলের সংগ্রাম, তাদের শিল্প-সংগ্রামে মৌলিকত্ব বয়ে চলার প্রত্যয়ী মেজাজ আমাদের এই ভাঙাচোরা সময়ে যেন আরো বেশি শেকড়ের দিকে নিয়ে যায়। যখন দেখি শিল্পী ভারতবর্ষের ইতিহাস, ধ্রুপদী সংগীত, নৃত্য, মহাকাব্য থেকে বিষয় সন্ধান করে নিজস্ব চিন্তার সাথে মিলিয়ে সৃষ্টি করছেন একের পর এক কালজয়ী চিত্র, অনেক ঘুমহীন রাত্রি অতিবাহিত করছেন চরম অতৃপ্তি আর পৃথিবীভরা হাহাকারের মধ্যে, তখন কোথায় যেন আমাদের মত অর্বাচীনেরও এক আত্মীয়তা তৈরি হয় এই ইতিহাস স্রষ্টার

সাথে। বরাবর সাদামাটা জীবনযাপন করা এই মানুষটির কথায় কথায় ঝরে পড়েছে বিনয় আর লাজুক স্বভাবের খাদহীন ঔজ্জ্বল্য।

সেকালের কলকাতার দূর্গাপুজোর আন্তরিক হৈ-চৈ, শোলা-সলমা আর চুমকির সাজে সজ্জিত প্রতিমার অলৌকিক মুখ, কখনো বা বৃষ্টিভেজা একঘেয়ে কলকাতার শীত-সন্ধ্যা পত্রাবলির ভাঁজে ভাঁজে রেখে গিয়েছে সে কালের বঙ্গ সংস্কৃতিকে। আমাদের সৌভাগ্য এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা একজন চিত্রশিল্পীর লেখা ও রেখার যুগলবন্দিতে আমরা পেয়েছি। এই বই আমাদের শেখায় সমকালকে কিভাবে একজন শিল্পী তার কলম-তুলির শৈলী দিয়ে গেঁথে রেখে যান অমরত্বের গায়ে। কখনো সারা বছর ধরে দুই বা তিনটি ছবি এঁকে ওঠা এই মানুষটি ভাবিত হচ্ছেন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ক্রমেই বেড়ে চলা বাজারি লালসায়। ঘটনাসঙ্কুল রাজনীতির আবর্তে হাঁসফাঁস করছে মানুষ ... এ তো আজও সমান প্রাসঙ্গিক। তাই ক্ষীণ চাঁদ ওঠা গভীর রাত্রিতে সদ্য ছোঁয়া হৈমন্তী কুহেলিকা এই বইটিকে করে তুলেছে আরও নিবিড়।

বইটির মাঝের অংশে একজায়গাতে লেখক কথা প্রসঙ্গে ভারতীয় চিত্র-ভাস্কর্য শিল্পে মনুষ্যেতর প্রাণীর স্বমহিমায় আবির্ভাবের কথা যথার্থই বলেছেন। মানুষের নিরবচ্ছিন্ন আত্ম-আরাধনা থেকে মুক্তি ও প্রকৃতিচিত্রের প্রাসঙ্গিকতায় এই মনুষ্যেতর প্রাণীর ভূমিকা তাঁর কাছে যথার্থ। আমরাও এই মতে সহমত পোষণ করে তৃপ্ত হই।

একবার ১৯৮১ সালে শ্রীমতী আব্রাহামের লণ্ডনে প্রদর্শনীর কথা প্রসঙ্গে লিখেছেন – উনি এ দেশীয় ছবি পাশ্চাত্য দর্শকের কাছে পৌঁছে দিতে যে আন্তরিকতা দেখিয়েছিলেন তা সেকালের বা একালের শিল্পীকূলের কাছে অত্যন্ত আশাব্যাঞ্জক। কলকাতায় দলীয় প্রদর্শনীতে যোগদানের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে বারবার, এখানেও সেই ক্ষমতাসীন দলের প্রতি অভিমান প্রদর্শনের শাসিত স্বরূপ, দিল্লীতে ডাক না পাওয়া ইত্যাদি কত ছোটো ছোটো হাসি-কান্না এই বইতে গাঁথা আছে তা এই ক্ষুদ্র পরিসরে বলার নয়।

একবার ‘বহুরূপী’ নাট্যগোষ্ঠীর ‘মৃচ্ছকটিক’ নাটকটি দেখার পর শিল্পী বন্ধুবর ‘কানু’-কে যে অসাধারণ বর্ণনা দিয়েছিলেন তা স্বর্ণাক্ষরে বাঁধিয়ে রাখার মতো। পাঠককে এই সৌভাগ্যের অংশীদার করতে উদ্ধৃত করলাম : ‘... ... কেমন যেন মনে হচ্ছিল শিল্প বোধহয় জীবন-সত্যের সমান্তরাল অন্য কোনো সত্যের ধারকভূমি। পলায়ন নয়, প্রতিফলনও নয়। প্রকৃতির দেওয়া ছ’টি যে ইন্দ্রিয় আমাদের, তাদের অতিক্রম করে আরো একটি ইন্দ্রিয় উদ্গত হয়। শিল্প বোধহয় সেই সপ্তম ইন্দ্রিয়ের নাম। জীবনের সঙ্গে জীবনাতীতের, সত্যের সঙ্গে

মিথ্যার, আপাতের সঙ্গে প্রত্যক্ষের সংঘর্ষে বিধাতা যে বাস্তব সৃষ্টি করেছেন, শিল্প সে বাস্তবের ব্যাখ্যাকার নয়, শিল্প আরেক সম্ভব মাত্র। ... Landscape ছবি যে আসলে বিশ্বস্রষ্টার আরতি প্রদীপ – একথাটা মানছি।'

আমরা যারা চার দেওয়ালের মধ্যে বসে ছবি আঁকি, একটু আধটু কাব্যচর্চা করি বা কদাচ মূর্তি তৈরির মত গুরুভার কাঁধে নেওয়ার দুঃসাহস দেখাই তাদের চিন্তার মূলস্রোতকে

তিনি কি সুন্দরভাবে বলেছেন! সমগ্র শিল্পচিন্তাই যেন এক হীরকখণ্ডের দূর্ভেদ্য অথচ কেন্দ্রীভূত আলোকচ্ছটার দিকে ধাবমান স্রোত তাঁর কাছে। বইটির এক অংশে আধুনিক চিত্রকলার গতিপ্রকৃতি নিয়ে বিশ্লেষণে শিল্পীর চিন্তা এতদিন পরেও মনে হয় একইরকম সময়োপযোগী। সত্যিই, বর্তমানে বিভিন্ন আর্ট গ্যালারিগুলোতে আধুনিক শিল্পের যে প্রদর্শন দেখি বা নতুন বয়সের শিল্পীদের মধ্যে যেরূপ চিন্তার গভীরতা লক্ষ্য করি তাতে গণেশবাবুর বিশ্লেষণকেই শিরোধার্য করি। একবার গগনেন্দ্র প্রদর্শশালাতে আমি একটি দলগত প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছিলাম। সেই প্রদর্শনীর উদ্বোধনে শিল্পী বিজন চৌধুরী বলেছিলেন – 'হাল আমলের চিত্র নির্মাণে রং তুলির থেকে অন্য সব উপাদানের প্রয়োগে চমক তৈরীর দিকে মন দিয়ো না, নিজের চিন্তার আর সাধনার উপর বিশ্বাস রেখে কাজ করে যাও ...।' শিল্পী গণেশ পাইন বলেছেন – New art যেন অদৃষ্টপূর্ব কিছু করার বন্ধ্যা প্রতিযোগিতায় উন্মাদ শিল্পীকূলের হৈ-চৈ। আর ঠিক এইখানেই তিনি স্বীকার করেছেন, চিত্তপ্রসাদ, বিজন চৌধুরী, সোমনাথ হোর, বিকাশ ভট্টাচার্য প্রমুখ দিকপালদের দিগবিজয়ের কথা। সত্যিই সমকালের সমাজ-রাজনীতির বিষয়কে ছবিতে নিয়ে আসার এই প্রবণতা আমাদের মনে করিয়ে দেয় মানবিক মূল্যবোধ আর কর্তব্যের কথা।

সমগ্র বইটি পাঠের পর শিল্পী গণেশ পাইনের শিল্পচিন্তা, তাঁর কর্মনিষ্ঠা, নিরবচ্ছিন্ন কাজ করে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে নিরন্তর নতুনত্বের দিক-সন্ধান আমাদের এই সময়কে বিশেষত আমাকে অমৃতের সন্ধান দিয়েছে।

চিত্র পরিচিতি :১। 'শিল্পচিন্তা' বইটির প্রচ্ছদ; ২। শিল্পীর আত্মপ্রতিকৃতি; ৩। শিল্পীর লেখা চিঠির নমুনা।